আল্লাহ তায়ালার এককত্বের প্রমাণ

ইজহারুল ইসলাম

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের মাঝে সর্বপ্রধান বিষয় হল, আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্বের উপর ঈমান আনয়ন করা। এই বিশ্বাস করা যে, সৃষ্টা হিসেবে তিনি একক, গুণাবলীর বিবেচনায় তিনি একক এবং উপাসনার যোগ্য একমাত্র তিনিই। পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সঃ) এর সমস্ত হাদীস তাওহীদ তথা আল্লাহর এককত্বের উপর ভিত্তি করেই আবর্তিত। কোন বিষয়ে আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার নেই, এটিই এ বিশ্বাসের মূলমন্ত্র। পবিত্র কুরআনের ১১২নং সূরায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে।

একজন ধর্মবিশ্বাসী তাওহীদবাদী আস্তিকের জন্য তাওহীদ বোঝার জন্য কোন ফিলোসফি বা দর্শন বোঝার প্রয়োজন নেই। সে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করে এবং আল্লাহর এককত্বের স্বাক্ষর প্রদান করে। একজন নাস্তিক যে বাস্তবতার চেয়ে যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে তার জন্য বিষয়টি উপলব্ধি করা কঠিন। এজন্য আমরা এখানে আল্লাহর এককত্বের উপর পাঁচটি যুক্তি উপস্থাপন করব।

AKn¨vg †iRi Gi ZËt

কুরআন স্পষ্টভাষায় জিজ্ঞাসা করেছে, এই মহাবিশ্ব কি এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে? এর উত্তর খুবই সহজ ও স্পষ্ট। কেননা ভৌত পদার্থবিদ্যা এবং সকল দর্শন এবিষয়ে একমত যে, যে বস্তু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে, তার অস্তিত্বের পিছে একটি কজ বা কারণ রয়েছে। আর মহাবিশ্ব যেহেতু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এসেছে এজন্য এর পিছে একটি কারণ বা কজ রয়েছে। মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পিছে একটি সামগ্রিক কজ বা কারণ থাকাটাই যুক্তিযুক্ত। অসীম সংখ্যক কারণ থাকাটা অসম্ভব। কেননা বাস্তবে কখনও অসীম কোন কিছু থেকে আমরা কোন ফলাফল লাভ করি না। উদাহরণ হিসেবে নিম্নের দু'টি বিষয় লক্ষ্য করুণ-

১. কোন কক্ষে যদি অসীম সংখ্যক মানুষ থাকে এবং সেখান থেকে যদি আমি দু'জনকে বাদ দেই, তাহলে কতজন থাকবে? আপনি উত্তর দিবেন, অসীম বিয়োগ দুই। অর্থাৎ অসীম থেকে দু'জনকে বাদ দিলে যা থাকে। এর দ্বারা বাস্তবে কোন অর্থ বোঝায় কি? অসীম থেকে যদি দুজনকে বাদ দেয়া হলেও কক্ষে অসীম সংখ্যক মানুষই থেকে যাবে। বাস্তবে এটি বিশেষ কোন অর্থ প্রদান করে না। আপনাকে যদি কক্ষের অসীম সংখ্যক লোক গণনা করতে বলা হয়, আপনার পক্ষে তা গণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু লোকসংখ্যা যদি অসীম থেকে সামান্য কমিয়ে গণনা করতে বলা হয়, তবুও আপনার পক্ষে তা গণনা করা সম্ভব নয়। এর অর্থ হল, বাস্তব জীবনে অসীম সংখ্যা থেকে বিশেষ অর্থ বোঝা সম্ভব নয়।
২. মনে করুন, আমি একজন সৈনিক। আমি একটা শত্রুকে গুলি করতে চাই। আমার গুলি করার জন্য আমার পেছনের সৈনিকের অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। আমার পিছের সৈনিকের জন্য আবার তার পেছনের সৈনিকের অনুমতি প্রয়োজন। এভাবে এ ধারা যদি চলতে থাকে এবং আমার গুলি করার জন্য অসীম সংখ্যক সৈনিকের অনুমতির প্রয়োজন হয়, তবে আমি কি আদৌ শত্রুকে গুলি করতে পারব? উত্তর খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। একইভাবে আমি মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পিছে যদি অসীম সংখ্যক কারণ ধরে নেই, তবে আদৌ মহাবিশ্বের অস্তিত্ব সম্ভব হত না। এবং কখনও এটি অস্তিত্বে আসত না। সুতরাং মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পিছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন ও একক কারণ থাকাটাই যুক্তিসঙ্গত।

আপনি এ যুক্তি দেখাতে পারেন যে, উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য তথা স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন একাধিক কারণ একই সাথে ক্রিয়াশীল হলে সমস্যা কোথায়?

আমি বলব, আপনার এ যুক্তিটা খুবই দুর্বল প্রকৃতির। চতুর্দশ শতাব্দীর দার্শনিক অকহ্যাম রেজর এর তত্ত্বের মাধ্যমে আপনার এ যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হয়। অকহ্যাম রেজরের নীতি হল,

Pluralities non set ponenda sine necessitate

প্রয়োজন ছাড়া বহু সংখ্যার ব্যবহার অনুচিৎ। আরেকটু সহজ করে বললে এভাবে বলা যায়,

The simplest and most comprehensive explanation is the best explanation.

অর্থাৎ সবচেয়ে সরল ও সর্বাধিক অর্থবহ ব্যাখ্যা হল, সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

অতএব, কোন প্রমাণ ছাড়া, কিংবা প্রয়োজন ছাড়া আমরা এটা বলতে পারি না যে, মহাবিশ্বের সৃষ্টির পিছে অনেকগুলো কারণ ক্রিয়াশীল। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদেরকে সবচেয়ে অর্থবহ ও সরল কারণ তথা মহাবিশ্ব সৃষ্টির একক কারণকেই গ্রহণ করতে হবে। কেননা এক্ষেত্রে আমাদেরকে কাছে কোন প্রমাণ নেই যে আমরা বলতে পারি, মহাবিশ্বের সৃষ্টি মূলতঃ দুটি, তিনটি, কিংবা কয়েক হাজার কারণের কম্বিনেশন বা সমন্বয়। একাধিক কারণ গ্রহণের দ্বারা একটি স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ কারণে অতিরিক্ত কোন মাত্রা যোগ হয় না। যেমন, যখন বলা হল, মহাবিশ্ব একটি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কারণের দ্বারা সৃষ্ট, এ কথা দ্বারা যে অর্থ স্পষ্ট হয়েছে, যদি বলা হয়, মহাবিশ্ব দু’টি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কারণের দ্বারা সৃষ্ট, এ কথার দ্বারা অতিরিক্ত কোন অর্থ প্রকাশ পায় না। কেননা আমি যখন বলছি, কারণটি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তখন অন্য কোন সর্বময় ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। কারণটি যদি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী না হত,তবে সাহায্যকারী হিসেবে অন্য কোন কারণের প্রয়োজন পড়ত। এক্ষেত্রে কোন কারণই তখন স্বাধীন বা স্বয়ংসম্পূর্ণ কারণ থাকবে না। সুতরাং মহাবিশ্ব সৃষ্টির পিছে আমাদের মূলতঃ একটি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কারণের প্রয়োজন ছিল এবং এটুকুই যথেষ্ট কেননা কারণটি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

2. ‡hŠw³K cgvYt

যুক্তির দাবি হল, মহাবিশ্ব সৃষ্টি যদি অনেক প্রভূ থাকত, তবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়েছে। এবং আমরা মহাবিশ্বে যে সুষম শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সর্বোচ্চ সমাবেশ লক্ষ্য করে থাকি, অনেক প্রভূ থাকলে তা পরিলক্ষিত হত না। আপনি যুক্তি দেখাতে পারেন, আপনার গাড়িটি তৈরি করে অনেক মানুষ। যেমন, কেউ গাড়ীর বডি তৈরি করে, কেউ ইঞ্জিন আবার কেউ চাকা। কিন্তু পূর্ণ গাড়িটি তৈরি হলে সেটি একটি সুন্দর ও সুষম গাড়ি হয়ে থাকে। অতএব, একটি সৃষ্ট বস্তুর অনেক স্রষ্টা থাকলেও সেটি ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে।

আপনার এ প্রশ্নের উত্তর হল, মহাবিশ্ব সৃষ্টির পিছে আমরা যে কারণটি উল্লেখ করেছি সেটি হল, এমন একজন প্রভূ যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং ইচ্ছার ক্ষেত্রে এককভাবে স্বাধীন। কেননা প্রভূ তো তিনিই হবেন, যার অসীম

প্রয়োগিক ইচ্ছা রয়েছে। যদি অনেক প্রভূ থাকত, তবে প্রত্যেকের ইচ্ছা প্রয়োগের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হত, আর এটিই মহাবিশ্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হতো।

আপনি যুক্তি দেখাতে পারেন, এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, অনেকগুলো প্রভূ একটি বিষয়ে একমত পোষণ করতে পারে। অথবা এক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের পৃথক পৃথক ক্ষমতা থাকবে। এক্ষেত্রে আমরা বলব, এ ধরণের প্রভূর ইচ্ছা অসীম ও স্বাধীন নয়। ফলে এরা প্রভূ হওয়ার যোগ্য নয়।

এ বিষয়টি স্পষ্ট করে লিখেছেন, আক্বিদাতুত ত্বহাবীর ব্যাখ্যাকার ইবনে আবিল ঈয (রহঃ)। তিনি লিখেছেন-

" এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ যে যুক্তিটি উপস্থাপন করা হয়, তা হল, আর্গুমেন্ট অব এক্সক্লুশন (বর্জন নীতি)। এর সার কথা হল, যদি দু'জন স্রষ্টা থাকে, এবং তারা কোন বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে, যেমন একজন ক নামক ব্যক্তিকে স্থির রাখতে চাচ্ছে, আরেকজন তাকে গতিশীল করতে চাচ্ছে। অথবা একজন প্রভূ খ কে জীবন্ত প্রাণি বানাতে চাচ্ছে, আরেকজন চাচ্ছে যে, এটি জড়পদার্থ হিসেবে অবস্থান করবে। যুক্তির আলোকে যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তবে এখানে তিনটি অবস্থার কোন একটি ঘটতে বাধ্য-

১. উভয় প্রভূর ইচ্ছা বহাল রাখা হবে এবং তা বাস্তবায়ন করা হবে।
২. শুধু তাদের একজনের ইচ্ছা বহাল রাখা হবে।
৩. তাদের কারও ইচ্ছায় বাস্তবায়ন করা হবে না।

প্রথমটি সম্ভব নয়। কেননা এক্ষেত্রে দু'টি বিপরীত বিষয় একই সাথে অস্তিত্ব লাভ করা আবশ্যক হবে। যা অসম্ভব। অর্থাৎ একই সাথে একটি বস্তু জীবিত ও মৃত হতে পারে না। তৃতীয় বক্তব্যও বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় যে, একটি বস্তু গতিশীলও না, আবার স্থিরও না। একইভাবে একটি বস্তু জীবিতও না, আবার মৃত না। আর এটি অসম্ভব। সাথে সাথে তাদের কারও ইচ্ছায় যদি বাস্তবায়ন করা না হয়, তখন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাদের কেউ-ই নিজ ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়। ফলে প্রত্যেকেই প্রভূ হওয়ার যোগ্যতা হারাবে। দ্বিতীয় বক্তব্য অনুযায়ী, যদি দু'জনের মধ্য থেকে একজনের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করা হয়, এবং অপরজনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা হয়, তবে তিনিই হবেন একক প্রভূ। যার ইচ্ছা পরিত্যাগ করা হয়েছে, সে প্রভূ হওয়ার যোগ্য থাকবে না।

উপর্যুক্ত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই ভারসাম্যপূর্ণ মহাবিশ্বের একজন মাত্র প্রভূ থাকা সম্ভব, যিনি অসীম ইচ্ছার অধিকারী এবং একক ক্ষমতার অধিকারী।

3. aviYvMZ ˆewPÎt আমরা কিভাবে দু'টি জিনিসকে পরস্পর থেকে পৃথক করে থাকি? দু'জন ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি কিভাবে। এর উত্তর হল, আমরা এটা করে থাকি, কনসেপ্চুয়াল ডিফারেনসিয়েশন বা ধারণাগত বৈচিত্রের মাধ্যমে। এই ধারণাগুলো হল, স্থান, পারস্পরিক দূরত্ব, গঠন ও আকার-আকৃতিগত তারতম্য।

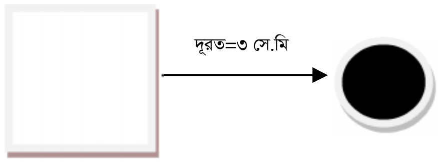
নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন-

চিত্র-১ | চিত্র-২

বর্ণঃ সাদা | বর্ণ: কাল

আকারঃ বড় | আকার: ছোট

আকৃতি: বর্গাকার চতুর্ভুজ। | আকৃতি: বৃত্তাকার



আমরা যে কোন দু'টি বস্তুর মাঝে পার্থক্য করতে পারি, তাদের পারস্পরিক দূরত্ব, বর্ণ ও আকার-আকৃতিগত বৈচিত্রের মাধ্যমে। দু'টি বিষয়ের মধ্যে যখন উপরোক্ত বিষয়গুলো না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে কি আপনি উক্ত বস্তু দু'টির মাঝে কোন পার্থক্য করতে সক্ষম হবেন? আপনি পারবেন না। এবিষয়টি শুধু দু'য়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অসংখ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে, উপরোক্ত বিষয়গুলো থাকা আবশ্যক।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলে নেয়া আবশ্যক যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণটি মহাবিশ্ব থেকে বহির্গত হওয়া আবশ্যক। কেননা সৃষ্টির কারণ যদি মহাবিশ্বের ভিতরগত কিংবা মহাবিশ্বেরই কোন অংশ হয়, তখন এর অর্থ হয় যে, মহাবিশ্ব নিজেই নিজের স্রষ্টা। আর এটি অসম্ভব। মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণ যেহেতু বহির্গত, আপনি সহজেই অনুমান করতে পারবেন যে, আপনি মহাবিশ্বের বহির্গত বিষয়ের মধ্যে অবস্থান, আকার-আকৃতি ও বর্ণগত পার্থক্য করতে পারবেন না। কেননা এ বিষয়গুলো কেবল মহাবিশ্বের অভ্যন্তরে বিশেষ অর্থ প্রদান করে, এর বাইরে নয়। কেননা উপর্যুক্ত বিষয় তথা দূরত্ব, আকার-আকৃতি বা বর্ণ প্রত্যেকটি সৃষ্ট। মহাবিশ্বের বাইরে সৃষ্ট কোন বস্তু নেই। মহাবিশ্বের বাইরে উপর্যুক্ত বিষয়ের অনুপস্থিতির কারণে সৃষ্টির পিছে ক্রিয়াশীল দু'টি কারণের মধ্যে পার্থক্য করাও সম্ভব নয়। এজন্য সৃষ্টির পিছে দু'টি বা অসংখ্য কারণের কথা বলাটাও ভিত্তিহীন, অযৌক্তি ও ধারণাপ্রসূত একটি বক্তব্য।

4. Abb¨Zvt মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণটি ইউনিক বা অনন্য হওয়া আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তাঁর কোন সমকক্ষ নেই"। মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণটি যদি অনন্য না হয়, তবে এর অর্থ হবে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণ ও মহাবিশ্বের মাঝে একটি সিমিলারিটি বা সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা এর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণটি এর মাঝে রয়েছে। যার অর্থ এই দাঁড়াল যে, মহাবিশ্ব নিজেই নিজের স্রষ্টা। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণটি মহাবিশ্বের সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারবে না কেন? এর উত্তরটি খুবই সহজ। আমরা

জানি মহাবিশ্ব অসংখ্য বস্তুর সমষ্টি। সুতরাং মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণটি অবশ্যই ইম্যাটেরিয়াল বা বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে হতে হবে। নতুবা মহাবিশ্ব নিজেই নিজের স্রষ্টা হওয়া আবশ্যক হবে। তাপগতির প্রথম সূত্র আআমাদের এ বক্তব্যটিকে শক্তিশালী করে। তাপগতির প্রথম সূত্র হল, Energy can not be created or destroyed অর্থাৎ “শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই, শক্তি একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত হয় মাত্র”। এর অর্থ হল, শক্তি বা বস্তু নিজেই নিজের স্রষ্টা হতে পারে না। সুতরাং বস্তু সৃষ্টির কারণটিও যদি বস্তু হয়, তবে বস্তু নিজেই নিজের স্রষ্টা হওয়া আবশ্যক, যা অসম্ভব। সুতরাং উপসংহারে আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণটি অবশ্যই ইম্যাটেরিয়াল ও ইউনিক হতে হবে।
আমাদের এ বক্তব্যটি স্রষ্টার এককত্বের প্রমাণ হয় কিভাবে? আমরা বলব, মহাবিশ্ব সৃষ্টির কারণ যদি একাধিক হয়, তবে তার কোনটিই ইউনিক বা অনন্য হবে না। ফলে স্রষ্টা একজন হওয়াটাই নির্দিষ্ট।

৫. ঐশীবাণীঃ

স্রষ্টার এককত্ব প্রমাণের সবচেয়ে সহজ উপায় হল, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ঐশীবাণীর শরণাপন্ন হওয়া। এক্ষেত্রে যুক্তি হল, কোন বাণীর ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং এটি মানব রচিত নয়, তখন এ গ্রন্থের বক্তব্যের ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ঐশী গ্রন্থে আল্লাহ তায়ালা নিজের সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করবেন সেটি নিশ্চিতভাবে সত্য বলে বিবেচিত হবে।

কেউ যদি আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ হয় তবে সে কিভাবে আল্লাহ সম্পর্কে বা তার প্রেরিত কিতাব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে? এর দু'টি পদ্ধতি রয়েছে-

১. ইন্টারন্যালি (আত্মদর্শন বা আত্মপরীক্ষা) ২. এক্সটারন্যালি (বাহ্যিকভাবে)।

B›Uvib¨wj: আভ্যন্তরীণভাবে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় পাওয়ার অর্থ হল, আপনি আত্মপরীক্ষা বা আত্মদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যবহার করে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। আজব ব্যাপার হল, আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন মানুষের নিজস্ব শক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। এর কিছু কারণ নিম্নে প্রদত্ত হল-

১. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বৈচিত্রময়। ব্যক্তি বৈচিত্রের এধারাটি মূলতঃ মানুষের মানসিক ভিন্নতারই বহিপ্রকাশ। সাইকোলজিক্যাল ভিন্নতার প্রধান কারণ হল, ডি.এন.এ এর ভিন্নতা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, সামাজিক পূর্বসূত্র, বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা, লিঙ্গের বৈষম্য ইত্যাদি নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত। আত্মদর্শনের মাধ্যমে স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা পেতে এবিষয়গুলো আপনাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে। সুতরাং আপনার আত্মপরীক্ষার মাধ্যমে যে ফলাফল পাওয়া যাবে সেটি অন্যদের থেকে ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। আপনি নিজেও এই বাস্তবতা উপলব্ধি করবেন যে, উপর্যুক্ত বিষয়ের উপস্থিতিতে আপনি একাকী যদি স্রষ্টা সম্পর্কে

ধারণা পেতে চান তবে তা সত্য থেকে অনেক বিচ্যুত হতে বাধ্য। এটি একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ বছর আগে পৃথিবীতে প্রায় ৩৭০০ হাজার দেবতার ধারণা মানুষের মনে জেঁকে বসেছিল।

২. দ্বিতীয় কারণ হল, বাস্তবতার বিবেচনায় মানুষ খুবই সীমাবদ্ধ। এজন্য মানুষ যদি নিজের পক্ষ থেকে স্রষ্টা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে চায়, তবে তা অধিকাংশ সময় ভ্রান্তির কারণ হয়। দার্শনিকগণ স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে কিছু যুক্তিসঙ্গত দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপন করে থাকেনা। তারা স্বতঃসিদ্ধ ও বাস্তব কোন তথ্য দিতে অক্ষম। প্রকৃতপক্ষে যদি আপনি স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে চান, তবে তা হবে ইঁদুরের পক্ষে হাতির শক্তিমত্তা সম্পর্কে ধারণা অর্জনের মতো হাস্যকর। এজন্য শুধু যুক্তি বা ধারণার উপর ভিত্তি করে স্রষ্টা সম্পর্কে কিছু বলা তার সম্পর্কে মিথ্যাচারের নামান্তর। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে যা জান না, তা বলো কেন?" সুতরাং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে আমরা যদি জ্ঞান অর্জন করতে চাই তবে তা অবশ্যই এক্সটারন্যাল বা বহির্গত কোন মাধ্যমে হতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ঐশীবাণীর মাধ্যমে আমাদেরকে যা জানিয়েছেন, সেটিই হবে বিশুদ্ধ জ্ঞান।

বিষয়টি বোঝার জন্য নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন! আপনি জানেন যে, স্রষ্টা আছে, কিন্তু স্রষ্টা সম্পর্কে আপনার পূর্ণ ধারণা নেই। আপনার বিষয়টি এমন যে, আপনি জানেন আপনার দরজার পিছে কেউ আছে যে দরজায় কড়া নাড়ছে, এখন আপনি যদি তার সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে চান, তবে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে সে কে? দরজার পিছের ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করার জন্য আপনাকে তার দেয়া তথ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। সুতরাং আপনি যদি স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে চান, তবে স্রষ্টার দেয়া বাণীর উপর নির্ভর করতে হবে।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা অর্জনের বাহ্যিক মাধ্যম হলো, পবিত্র কুরআন। কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়ে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান রয়েছে। এবং একটি গ্রন্থ ঐশীবাণীর হওয়ার জন্য যতগুলো শর্ত রয়েছে, কুরআনের মাঝে সবগুলো শর্তই বিদ্যমান। যেমন-

১. এটি স্রষ্টা সম্পর্কে যুক্তিসম্মত ও সহজাত ধারণা দিবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন গ্রন্থ যদি একথা বলে যে, স্রষ্টা হল, একটি হাতি যার চল্লিশটা হাত রয়েছ, তবে আপনি খুব সহজেই অনুধাবন করবেন যে, এটি কখনই স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়। কেননা স্রষ্টা আর সৃষ্টি কখনও এক জিনিষ নয়।

২. এটি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। যেমন কোন গ্রন্থ যদি এমন তথ্য দেই যে, এর ২০ নং পৃ. রয়েছে যে, স্রষ্টা একজন এবং এর ৩৪০ নং পৃ. রয়েছে যে, স্রষ্টা তিনজন। এর দ্বারা স্পষ্ট যে, এটি স্রষ্টার পক্ষ থেকে কোন গ্রন্থ নয়, কেননা স্রষ্টার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কোন গ্রন্থ অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। এছাড়াও কোন গ্রন্থ যদি এ তথ্য দেই যে, মহাবিশ্বের বয়স ৬০০০ বছর, তবে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি যে, এটি বিশুদ্ধ তথ্য নয়। ফলে এটি স্রষ্টার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কোন কিতাব নয়।

৩. এটি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ তার ঐশ্বরিক প্রমাণ থাকা আবশ্যক।
পবিত্র কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হল, "হে নবী আপনি বলুন! আল্লাহ একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কোন কিছু জন্ম দেননি, তিনি কারও থেকে জন্ম লাভ করেননি। তার সমকক্ষ কোন কিছু নেই।"
[পবিত্র কুরআনের ১১২ নং সূরা]